গুম ও অপহরণঃ নাগরিক উদ্বেগ ও করণীয়

আলী ইমাম মজুমদার, সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও নির্বাহী সদস্য, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক

রাষ্ট্র ব্যবস্থার সূচনা থেকেই এর দায়িত্ব ছিল জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা। গোত্রীয় শাসন বা নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের কালেও গোত্র প্রধান কিংবা রাজাকে জনগণ কর দিত অর্থ বা পণ্যসামগ্রী দিয়ে। বিনিময়ে রাজা কিংবা গোত্র প্রধান তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন জনসমষ্টির নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত করত। এতে বড় ধরনের ব্যর্থতা দেখা দিলে সে শাসন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হত। আর আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের তো লক্ষ্যই থাকে দুষ্টের দমন আর শিস্টের পালন। সুনাগরিকগণ স্বভাবতই রাষ্ট্রের আইন মেনে চলেন। তাই রাষ্ট্রশক্তিও তাদের সহায়ক ভূমিকাতে থাকে। যারা আইন মেনে চলে না যেমন- দস্যু, তস্কর, খুনী কিংবা অন্য কোন অপরাধী তাদেরও বিচার করে শাস্তি দেবার অধিকার একমাত্র রাষ্ট্রের। তাও আইনের দ্বারা নির্ধারিত নিয়মে। আমাদের প্রজাতন্ত্রে এটার নিশ্চয়তা দিয়েছে সংবিধান। সংবিধানে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অংশে নাগরিকদের এ ধরনের অধিকারগুলো ভোগ করার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। তেমনি আইন অনুযায়ী, অপরাধীকে বিচারের দায়িত্বও নিয়েছে রাষ্ট্র। কোন ঘটনায় কেউ দোষী কিংবা নির্দোষ, দণ্ডিত হবে বা অব্যাহতি পাবে তা নির্ধারণের দায়িত্ব রাষ্ট্র দিয়েছে আদালতকে। আদালতের সহায়ক সংগঠন হিসেবে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাসহ আরও প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট নিয়োজিত থাকে। এর খুঁটিনাটি উল্লেখ আছে আইনে। এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ঘটিয়ে কাউকে দণ্ডিত করা যেমন- আটক রাখা, হত্যা কিংবা অন্য কোনরূপ সাজা বিধানের দায়িত্ব কোন ব্যক্তিবিশেষ বা সংস্থা নিতে পারে না। যদি নেয় তখনই রাষ্ট্রশক্তির কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন আসে। এমনকি কোন রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ আইন দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হয়ে কোন নাগরিকের মৌলিক অধিকার হরণ করলে সেটা দণ্ডনীয় অপরাধ। অপর কেউ তা করলে বা করে চললে এটাকে রাষ্ট্রশক্তির প্রতি চ্যালেঞ্জ বলে গণ্য করা যৌক্তিক হবে।

আজকের বাংলাদেশে গুম ও অপহরণ এক সর্বনাশা মাত্রা লাভ করেছে। এতে নাগরিক সমাজ ক্ষুব্ধ, ব্যথিত ও শঙ্কিত। অপরাধের বহুমাত্রিকতা বিবেচনায় নিলে এ ক্ষোভ, বেদনা আর শঙ্কাকে অমূলক বা বাড়াবাড়ি বলা যাবে না। দিনে দুপুরে প্রকাশ্য রাজপথ কিংবা শহরের জনাকীর্ণ কোন স্থান থেকে অপহরণ করা হচ্ছে – ক্ষেত্রবিশেষে একজন কিংবা একাধিক ব্যক্তিকে। গত ২৭শে এপ্রিল নারায়ণগঞ্জে দিনে দুপুরে একই দিনে একই স্থান থেকে সাত জনকে অপহরণ করা হয়। সে সাতজনের একজন সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র আরেকজন আইনজীবী। ২৯ ও ৩০শে এপ্রিল শীতলক্ষ্মা নদীতে ভাসমান অবস্থায় পেট চেরা ও শক্ত রশি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় তাদের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মামলার প্রধান আসামীও সিটি কর্পোরেশনের একজন নির্বাচিত কাউন্সিলর। তদুপরি জানা যায়, তিনি স্থানীয় একজন প্রভাবশালী সংসদ সদস্যের আস্থাভাজন ও একই রাজনৈতিক দলের ব্যক্তি। বিস্ময়কর ব্যাপার হল অপরপক্ষের রাজনৈতিক অবস্থানও একইরূপ। তবে পক্ষদুটির মাঝে বেশকিছু কাল ধরে বিরোধ চলছিল। প্রকৃত ঘটনা কী আর কীভাবে কারা ঘটালো তা তদন্ত করে দেখার দায়িত্ব আইন প্রয়োগকারী সংস্থার। যথাযথ তদন্ত করে দ্রুত বিচারে প্রকৃত অপরাধী সাজা পাক এ প্রত্যাশা সকলের। কিন্তু তদন্তে আসল ঘটনা বা অপরাধীগণ চিহ্নিত হবে বলে মনে করতে সাহসী হচ্ছেন না অনেকে। এ ধরনের ঘটনার অতীত তদন্তের ঐতিহ্য তাই বলে। বিরল ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে প্রায় সবাই পার পেয়ে গেছে। এ ঘটনাতে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসছে তা বিস্ময়কর ও ভয়াবহ। এ ঘটনার অল্পদিন আগে গত ১৬ই এপ্রিল দুপুরের পর নারায়ণগঞ্জ থেকে ফেরার পথে অপহৃত হন প্রখ্যাত পরিবেশ আইনবিদ সৈয়দা রেজওয়ানা হাসানের স্বামী আবু বকর সিদ্দিক। সে অপহরণ ঘটনাটির পর পরই গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজে ব্যাপক তোলপাড় শুরু হয়। সরকারি বিভিন্ন সংস্থাও আন্তরিক প্রচেষ্টা চালায় তাঁকে অক্ষতভাবে দ্রুত উদ্ধারের। দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ ঘন্টা পর অপহরণকারীগণ তাঁকে মুক্তি দেয়। এটা সকলের যৌথ সাফল্য। তবে অপহরণ যারা করেছিল তাদের কাউকে এখনও আইনের আওতায় আনা হয়েছে এমনটা জানা যায় না।

অপরাধ হিসেবে অপহরণ বা গুম হঠাৎ করে আমাদের দেশে শুরু হয়েছে এমনটি নয়। অনেক আগ থেকেই এ ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড হয়ে আসছিল। তাই এসব অপরাধকে আইনের আওতায় নেওয়া হয় ১৮৬০ সনে প্রণীত দণ্ডবিধিতে, যা এখনও বলবৎ আছে। এ দণ্ডবিধিতে বিভিন্ন অপরাধের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা আছে। তার মাঝে Kidnap, Abduction আর Wrongfully concealing or keeping in confinement গুরুত্বপূর্ণ। আর খুন, চাঁদাবাজি তো আছেই। এগুলো সবই ধর্তব্য অপরাধ। এ ধরনের অপরাধের শাস্তিস্বরূপ অপরাধীর গুরু দণ্ডের বিধান রয়েছে।

একটি সমাজে অপরাধ হতে পারে। তবে সে অপরাধ হবার পর যদি সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থা আইনের আওতায় অপরাধীর উপযুক্ত দণ্ডবিধান নিশ্চিত করতে পারে তবে এ প্রবণতা হ্রাস পায়। নিয়ন্ত্রণে থাকে আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা। এর ব্যতিক্রম হলে পুনঃপৌনিকভাবে বৃদ্ধি পায় অপরাধ প্রবণতা। ক্ষেত্র বিশেষে তা লাগামহীনভাবে বেড়ে সমাজের জন্যে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের দেশে এ ধরনের অপহরণ, অপহৃতদের হত্যা ও গুম আর মুক্তিপণ আদায় মোটামুটি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর পরিস্থিতি এ পর্যায়ে আসার জন্যে বেশকিছু অনুসঙ্গ দায়ী বলে জোরালোভাবে বিশ্বাস করা হয়। সেগুলো হচ্ছে প্রতিহিংসা, মুক্তিপণের নামে অতি সহজে বিশাল অঙ্কের টাকা উপার্জন, আর ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে কারও অপরাধমূলক কার্যক্রমের বাধা অপসারণ। প্রতিহিংসা অনেক ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক বলে দাবি করা হয়। তবে সে রাজনীতি যতটা না নীতি বা আদর্শ নিয়ে তার চেয়ে বেশি লুণ্ঠন, চাঁদাবাজিসহ অন্যায় কাজের সামাজিক কর্তৃত্ব নিয়ে। একেবারে হালআমলের বলে নারায়ণগঞ্জের ঘটনাগুলোকেই এখানে উদ্ধৃত করা হল। তবে উল্লেখ করতে হয় যে, এধরনের ঘটনা বর্তমানে দেশের সর্বত্র প্রায়শ ঘটছে। শুধু ঘনঘন ঘটছে বললে কম বলা হবে। বরং বলা যায়, এটা অব্যাহতভাবে বেড়ে চলছে। আমরা ভুলিনি নভেম্বর ২০১২ সালের কেরানীগঞ্জে শিশু পরাগ মণ্ডলের অপহরণ কাহিনী। জোরালো আলোচনায় ছিল আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার প্রচেষ্টার পাশাপাশি শিশুটিকে তার পিতা মোটা অঙ্কের মুক্তিপণ দিয়ে উদ্ধার করেছেন। সাম্প্রতিককালে চট্টগ্রামের একজন স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে অপহরণ কাহিনীও অনেকের স্মরণে থাকবে। কয়েকদিন পর বিধ্বস্ত অবস্থায় তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। তবে অপহরণের পর হত্যা করা হয় নারায়ণগঞ্জের তুকি নামক এক মেধাবী কিশোরকে। সাবেক এমপি ইলিয়াছ আলী আর ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর চৌধুরী আলমের কোন খোঁজ আজ অবধি মেলেনি। মুক্তি পাওয়া অপহৃত স্বর্ণ ব্যবসায়ীর বক্তব্য হচ্ছে– একটি আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার জনৈক কর্মকর্তা তার সম্পদ হরণ করায় নালিশ করলে এ ভোগান্তিতে তাঁকে পড়তে হয়। এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসতে পারে মানুষ তাহলে প্রতিকারের জন্যে যাবে কোথায়? ক্ষেত্র বিশেষে দেখা যায়, এ ধরনের অপরাধ ঘটার পর অপরাধীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিংবা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নির্দেশ দেন। আইনে সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান থাকার পরও এ ধরনের ধর্তব্য অপরাধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কারও নির্দেশের অপেক্ষায় থাকার কথা নয়। তাও থাকছে এমন অভিযোগই পাওয়া যায়।

২৯শে এপ্রিল *প্রথম আলো* আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সূত্রকে উদ্বৃত করে পাঁচ বছরের একটি অপহরণ চিত্র তুলে ধরেছে। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো–

২০১০ সাল	২০১১ সাল	২০১২ সাল	২০১৩ সাল	২০১৪ (প্রথম ৪ মাসে)
৪৬ জন	৫৯ জন	৫৬ জন	৬৮জন	৫৩ জন

ডেইলি স্টারের প্রতিবেদন অনুযায়ী, জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৪ সময়কালে অপহরণ করা হয় ৩৬ জনকে। এর মাঝে ১৩ জনের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। মুক্তি পেয়েছেন ৬ জন। অবশিষ্টরা এখনতক গুম রয়েছেন। উল্লেখ করা আবশ্যক সকল গুম ও অপহরণ সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায় না। তা সত্ত্বেও উপরের এ চিত্রটি দেখলে অপহরণ প্রবণতার ক্রমবর্ধমান দিকটি আলোচনার প্রয়োজন থাকে না। তবে আলোচনার আবশ্যকতা রয়েছে কেন এগুলো ঘটে চলছে? আর ঘটে চলছে দেশের সর্বত্র। উল্লেখ করতে হয় গত চারদলীয় জোট সরকারের সময়েও এ ধরনের ঘটনা ঘটতো। যেমন তাদের দলেরই একজন সমর্থক চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী জামাল উদ্দিন সে দলেরই কিছু ব্যক্তি কর্তৃক অপহৃত ও নিহত হন। গুম করা হয় তার লাশ। সে আমলে ঘটনাটি উদ্‌ঘাটিত হয়নি। এখনও যারা এ ধরনের গুম, অপহরণের সাথে জড়িত তাদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা আর নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ অপরাধ শনাক্তকরণে প্রধান বাধা বলে ব্যাপকভাবে ধারণা করা হয়।

অভিযোগ রয়েছে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার নিষ্ক্রিয়তা এ ধরনের ঘটনার জন্যে প্রধানত দায়ী। ক্ষেত্র বিশেষে তাদের কেউ কেউ এসব ঘটনার কোন কোনটির সাথে সংশ্লিষ্ট বলেও অভিযোগ পাওয়া যায়। নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগটিতো অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। তারা তৎপর ও সক্রিয় হলে এ ধরনের মর্মান্তিক দূর্ঘটনা একের পর এক ঘটত না। কেননা অপহরণের পর তড়িৎ, সম্ভাব্য অপরাধীদের ধাওয়া করলে কিছু ক্ষেত্রে অপহৃত ব্যক্তি দ্রুত মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মনে করা হয়,

এমনই ঘটেছে আবু বকর সিদ্দিক ও পহেলা মে নারায়ণগঞ্জ থেকে অপহৃত অপর একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে। আর তাদের দুর্বোধ্য নিষ্ক্রিয়তার শিকার সে শহরেরই সাত জন মানুষ, এমনটা বললে দোষ দেওয়া যাবে না। প্রধান অভিযুক্তের বাড়ি তারা তল্লাশি করেছে এক সপ্তাহ পর। এ জাতীয় নিষ্ক্রিয়তার জন্যে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তেমন কার্যকর কোন ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানা যায় না। তাই অপরাধ জগৎ কিংবা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কাউকেই আমরা এ ব্যাপারে লাল সংকেত দেখাতে পারিনি। কিংবা তা করতে অনেক দেরি করে ফেলেছি। আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা একবার নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে তার উপর নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠা সহজ নয়। সহজ কাজ নয় কোন বাহিনীর চেইন অব কমাণ্ডে ফাটল ধরলে সে ফাটল মেরামত করা।

আইন মেনে না চলার প্রবণতা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর একটি অংশের মধ্যেও উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে ১লা মে তারিখে ডেইলি স্টার পত্রিকার একটি প্রতিবেদন উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রতিবেদনটিতে উল্লেখ রয়েছে ২৮শে এপ্রিল ভোরের দিকে ময়মনসিংহের ভালুকা থেকে কোচিং সেন্টারের দু জন শিক্ষককে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা বাড়ি থেকে নিয়ে যায়। তেমনি সেখানে ২০ ও ২১শে এপ্রিল নিখোঁজ হয় যথাক্রমে এক জন ছাত্র ও এক জন ব্যাংক কর্মকর্তা। ৩০শে এপ্রিল আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর একটি দল সাংবাদিকদের সামনে তাদের হাজির করে। সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয় তারা গত ফেব্রুয়ারিতে জেএমবি'র তিন জন জঙ্গিকে ভালুকার প্রিজন ভ্যান থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যে দায়ী। ধৃত ব্যক্তিদের কেউ কেউ সাংবাদিকদের কাছে ঘটনার দায় স্বীকারও করেন। অভিযোগটি যথার্থ হলে তাদের আইন অনুযায়ী উপযুক্ত শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। তবে অন্তরীণের সময়কালে সুনির্দিষ্ট মেয়াদের মাঝে তাদের ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কেন হাজির করা হয়নি এর কোন জবাব মেলে না। এটা ফৌজদারি কার্যবিধির – এমনকি সংবিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। যারা জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের দায়িত্বে রয়েছেন তারা যদি এটাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করেন আর পেতে থাকেন দায়মুক্তি তাহলে এর পুনরাবৃত্তি হতেই থাকবে। আইন কেউ হাতে তুলে নিতে পারে না। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তা করলে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে ক্ষেত্র বিশেষে সাময়িক সুফল লক্ষণীয় হয়ত হবে, তবে স্থায়ীরূপ পাবে না। চূড়ান্ত বিবেচনায় এটা আরও খারাপ পরিস্থিতি ডেকে আনবে। ক্রসফায়ার আর বন্দুকযুদ্ধ অপরাধ জগৎকে স্বল্প সময়ের জন্যে লাল সংকেত দেয় বটে, তবে দ্রুতই ঘটে এর অবসান। নুতন উদ্যম ও কৌশলে অপরাধীরা তৎপর হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে এটা প্রমাণ হয়ে গেছে। তদুপরি এর অপপ্রয়োগের সুযোগ থাকে ব্যাপক। সে সুযোগ ক্ষেত্রবিশেষে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নাম করে পেশাদার অপরাধীরাও নিয়ে থাকে।

প্রসঙ্গক্রমে, গত ৪ মে ২০১৪, নারায়ণগঞ্জে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলন থেকে সাম্প্রতিকালের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর অপহরণ ও হত্যাকাণ্ডের শিকার সাতজনের অন্যতম নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর নজরুল ইসলামের শ্বশুর শহীদুল ইসলাম ছয় কোটি টাকার বিনিময়ে 'র‍্যাব'-এর বিরুদ্ধে এই হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ এনেছেন। গত ৫ মে ২০১৪ তারিখে জনৈক আইনজীবী নারায়ণগঞ্জে ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদন আদালতের নজরে আনলে বিচারপতি মোঃ রেজাউল হক ও বিচারপতি গোবিন্দ চন্দ্র ঠাকুরের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ স্বঃপ্রণোদিত হয়ে ঘটনা তদন্তে সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠনের আদেশ দেন। হাইকোর্টের আদেশে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে জনপ্রশাসন, আইন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিবের নিচে নয় এমন দু জন করে প্রতিনিধির সমন্বয়ে এই কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে, যেখানে র‍্যাবের কোন সদস্য রাখা যাবে না। একইসাথে আদেশ প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে কমিটি গঠন ও কার্যক্রম বিষয়ে অগ্রগতির প্রতিবেদন দাখিল করতে বলেছেন আদালত। অপরদিকে ঘটনা তদন্তে র‍্যাবের উদ্যোগেও একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে র‍্যাব-১১ এর অধিনায়ক লে: কর্নেল তারেক সাঈদ মোহাম্মাদ, মেজর আরিফ হোসেন এবং লে: কমাণ্ডার এম এম রানাকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা হয়েছে। তবে অপরাধ প্রমাণিত হলে শুধু বাধ্যতামূলক অবসরই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন কঠোর শস্তি প্রদান। ঘটনার নেপথ্যে যদি কোন প্রভাবশালী মহলও জড়িত থাকে, নির্দ্বিধায় তাদেরকেও দাঁড় করাতে হবে বিচারের মুখোমুখি।

সাম্প্রতিককালে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে নারায়ণগঞ্জের ঘটনাবলীর পর সকল শ্রেণির সচেতন মানুষ বিস্মিত, হতাশ, আতঙ্কিত ও বেদনাহত হয়েছেন। বর্ষীয়ান আইন প্রণেতা জনাব সুরঞ্জিৎ সেনগুপ্ত বলেছেন, অপহরণ সকল মাত্রা ছাড়িয়েছে। তবে কোন পর্যায়ে থাকলে এটা সহনশীল মাত্রায় থাকবে তা আমাদের কাছে বোধগম্য হচ্ছে না। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি রাষ্ট্রীয় সংস্থা। এর চেয়ারম্যান বলেছেন, অপহরণ, গুম আর হত্যার ঘটনা মানবাধিকারের জন্যে দুঃসহ অবস্থা সৃষ্টি করেছে। ১লা মে *প্রথম আলো*তে প্রকাশিত তাঁর বক্তব্য অনুসারে, 'প্রতিটি ঘটনাতেই সন্দেহের তীর ছোঁড়া হচ্ছে আইনশৃঙ্খলা

বাহিনীর উপর। কেননা এসব হত্যা ও গুমের দায় কোনভাবেই এসব বাহিনী অস্বীকার করতে পারে না।' তিনি পরামর্শ দিয়েছেন ইউনিফর্মধারী সদস্য ব্যতীত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কোন সদস্য কোন নাগরিককে গ্রেফতার করতে পারবে না। তদুপরি তাদের পরিচয়পত্রও থাকতে হবে। আটক ব্যক্তির পরিবারকে জানাতে হবে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে। আটকের সময় প্রতিবেশীদের মধ্য থেকে অন্তত দু জনকে সাক্ষী রাখার প্রস্তাবও তিনি করেছেন। তবে রাজপথ থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা যখন কাউকে অপহরণ করে তখন এ ধরনের আচরণবিধি অকার্যকরই হবে।

তবুও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন চেয়ারম্যানের উপরোক্ত প্রস্তাবগুলো গ্রহণ এবং আন্তরিকভাবে কার্যকর করা হলে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়। তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায়িত্বে যারা রয়েছেন তাদের সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় সহযোগিতায় এ ধরনের ঘটনা ঘটলে দ্রুত তদন্ত করে তাদেরও আইনের আওতায় আনতে হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমার উর্দ্ধে তাদের হেফাজতে কাউকে রাখলে এটাকে Wrongful confinement হিসেবে গণ্য করার প্রয়োজনীয়তা এখন সামনে চলে এসেছে। ঠিক তেমনি তাদের হেফাজতে থাকা কোন বন্দির ক্রসফায়ারের নামে জীবননাশ হলে খুন না হোক অন্তরীণ ব্যক্তির জীবন রক্ষার্থে ইচ্ছাকৃত অবজ্ঞার ফৌজদারি অভিযোগ আনার বিষয়ও আজ সময়ের দাবি। বন্দুকযুদ্ধের ঘটনাগুলো নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত অবস্থা যাচাই করে দেখা দরকার।

পরিশেষে বলতে হয়, রাষ্ট্র শাসন কিছুটা কঠিন কাজই বটে। তবে এ কাজটির দায়িত্ব যারা নেন তারা তা জেনে শুনেই নেন। মানুষের জীবন অতি মূল্যবান। এ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সুযোগ কারো নেই। বরং সে জীবন রক্ষার জন্যে তারা আইনত দায়বদ্ধ।